বব আর নানুক

অধ্যাপক রেবন্ত গোস্বামী

এখানে উত্তর সাগরে মিশেছে কানাডার হাডসন বে । বরফ গলা জল আর কনকনে ঠান্ডা হাওয়া । এই গ্রীষ্মেও লোমের কোট আর টুপি ছাড়া বাইরে বেরনো মুশকিল। মে মাসের সূর্যের আলো ঝিকিমিক করছে ঢেউয়ের মাথায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়ে আসছে কুয়াশারচাদর। হাঁটুজলে খেলে বেড়াচ্ছে কিছু ডলফিন। তীরের কাছেই। সীগালের ঝাঁক বসে আছে পাথরের ফাঁকে । ওরা জল দেখেছে। খুঁজছে খাবার। ফাঁকা জায়গায় চ্যাপ্টা পাথরের উপর শুয়ে একদল সীল। রোদ পোয়াচ্ছে। তীরেরছোট ছোট নুড়ি পাথরের গায়ে মুঠো মুঠো ফেনা ছড়িয়ে আসা যাওয়া করছে অলস ঢেউ । এক পরম শান্তিতে ছেয়ে আছে চারিদিক। ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে দু'জন মানুষ। জলের দিকে।

মা ডলফিন তীর বেগে সাঁতরে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। স্যামন মাছটাকে গভীর জল থেকে অনেক দূর তাড়িয়ে এনেছে সে। এবার মুখের সামনে পেতেই খপ্ করে তুলে পিছন দিকে ছুড়ে দিল মাছটা । পিছনে ছুটে আসছিল তার ছানা। কচি ডলফিন এখনও ভাল করে শেখেনি জল থেকে মায়ের মতো লাফ দিয়ে উঠতে । হাওয়া থেকে মায়ের মতো লাফ দিয়ে উঠতে । হাওয়া থেকে মাছ লুফে নিতে। স্যামনটাকে ধরতে দিয়ে মায়ের গায়ে ধাক্কা লেগে পিছলে পড়ল জলে। একটা সীগাল ছোঁ মেরে তুলে নিল মাছটা । ঠিক সেই সমইে মা ডলফিন দেখতে পেল জলের বাইরে খুব কাছেই দুটো কালচে ছায়া। বিপদ ? উল্টে ঘুরে দ্বিগুণ বেগে সে ছুটল গভীর জলের দিকে। ছোটটা ও ছুটল মাকে ধরতে । জলের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দুটি মানুষ। বব আর নানুক। তীরে ছড়িয়ে থাকা রাশি রাশি নুড়ি পাথরের দিকে চেয়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বব বলে উঠল, ''নানুক''।
---''কী?''
---''কত নুড়ি আছে সমুদ্রের তীরে, গুণতে পারো?''
---''নাতো?''
---''এই অগুন্তি নুড়িগুলোর মতো অনেক অনেক মানুষ থাকে দক্ষিণের দিকে। সারা পৃথিবীতে থাকে আরও অনেক মানুষ। একদিন তারা সবাই আমাদের দেখবে। 'ইনুইট'দের। খুদে চোখদুটোয় খুশীর ঝিলিক নানুকের । একগাল হেসে বলল,---''বুঝেছি। 'অ্যাগ্গি'।''
'ইনইট' মানে 'আমরা', 'অ্যাগ্গি' হল 'সিনেমা'। ইনুইটদের এস্কিমো ভাষায়। নানুক এস্কিমো। বব আমেরিকান, সাদা মানুষ। 'অ্যাগ্গি' শব্দটা নানুকের মাথা থেকেই বেরিয়েছে। সঠিক অর্থটা ববের জানা নেই। তার মুভি ক্যামেরারথেকে শু করে তোপায়া স্ট্যাণ্ড, ফি ল্ম, ছবি তোলা---সবই র 'অ্যাগ্গি'। 'অ্যাগ্গি'কে ভীষণ ভালোবাসে নানুক। এর জন্য সে সবকিছু করতে রাজি। ঠিক যেমনটি বব। অ্যাগ্গির জন্য প্রাণ হাতে নিয়ে মাসের পর মাস সে ঘুরে বেরিড়েছে বরফের দেশে । কুকুরে টানা স্লে - তে চড়ে। হাড়মাস ফুটো করা বরফের ঝড়ে। শরীর অবশ করা শীতের কামড় খেতে খেতে । সব কিছু পার হতে পেরেছে সে একটাই কারণে। তার 'অ্যাগ্গি'। তার সিনেমা । তার ভালবাসা।
এই ভালবাসাকে কিন্তু ছোটবেলায় চিনত না বব। তার মন পড়ে থাকত অ্যাডভেঞ্চার আর দেশবিদেশের অভিযানের গল্পে। স্কুলের পড়ার বই ফেলে সে পড়ত পার্কম্যান, ফেনিমোর কুপার, ব্যালান্টাইন। বাঁ হাতে ধরত কলম। খওয়ার টেবিলে, কাঁটাচামচ বাদ দিয়ে খেতে ভালবাসত শুধু ছুরি দিয়ে। সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি ছিল এক টুকরো মোকাসিনের চামড়া। রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে তার বাবার এনে দেওয়া। বন্ধুদের মাঝে মাঝে চামড়ার টুকরোটা সগর্বেদেখিয়ে নিজের দর বাড়াত সে। আর রাতের স্বপ্নে ঘুরে বেড়াত অচেনা মানুষদের অজানা দেশে । বাবা রবার্ট হেনরি ফ্ল্যাহার্টির মতো।

হেনরি ফ্ল্যাহার্টির কাজ খনি খুঁজে বেড়ানো। আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় এসে ঘর বেঁধেছেন। এখানকারই জার্মানমেয়ে সুজার ক্লখ্নারের সঙ্গে। বড় ছেলের নাম রেখেছেন 'যোসেফ'। রবাট। যোসেফ ফ্ল্যাহার্টি। আদর ক'রে 'বব'। তাঁর ধারণা, বড় হয়ে বব তাঁর মতোই

একজন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার বা 'প্রস্পেক্টর' হবে। যে সব দুঃসাহসী মানুষ অচেনা অজানা অঞ্চলে গিয়ে সেখানকার ভৌগোলিক স ম্পদের সন্ধান নিয়ে আসেন, মানচিত্র জুড়ে দেন নিত্য নতুন ---- আমেরিকায় তাঁদের বলা হতprospector । লাভজনক খনিজের খোঁ াজ করা ছাড়াও এঁরা স্বচক্ষে দেখে আসতেন সেই সব অজানা দেশের অনেক রহস্য । জলবায়ু কেমন, প্রাচীন আদিবাসী থাকে কিনা, প ানীয় জলের উৎস, সহজে যাতায়াতের পথ নির্দেশ । এরকম মানুষদের খুব চাহিদা তখন আমেরিকায়। নিজের ভাগ্য ফেরাতে এসে হেনরিও তাই এই পেশায় চলে আসেন। বব যখন ছোট, তখন তিনি বেশ পরিচিত প্রথম প্রথম দুর্গম অঞ্চলে যেতেন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে। ববের ছোটবেলা কাটে উত্তর মিশিগান আর কানাডার এই সব খনি অঞ্চলে । শহর থেকে দূরে দূরে। মানুষ বলতে খনির মজুর, ওভারসিয়ার আর স্থানীয় রেড় ইণ্ডিয়ানদের দল যারা সাহায্য করে খনিখোঁড়ার কাজে। ওদের গ্রাম, বসত সবই চলে গেছে খনির গর্ভে। উন্নতিশীল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলকারখানার চাহিদা মেটাতে ওদের নিজস্ব জমি ছেড়ে দিতে হয়েছে। সেই জমির বুক চিরে সাদা মানুষরা বার করছে লোহা, তামা, কয়লা, তেল। রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বব কিছুতেই মেলাতে পারতনা তার বইয়ে পড়া রেড ইণ্ডিয়ানদের। মাথায় নেই পালক গোঁজা। হাতে নেই বল্লম। চামড়ার পোষাক প'রে, মুখে আঁকিবুকি কেটে দল বেঁধে ছুটে যায় না ঘোড়ায় চেপে । সাহসী যোদ্ধাদের মতো নয়। বরং বলা যায়, তামাটে মুখের একদল ভীতু মানুষ। খনির কাজ করে। মোটঘাট বয়। ভ াবলেশহীন স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। কম কথা বলে। বোঝা যায় এরা আলাদা জাতের মানুষ। নিন্তু কখনোই মেলেনা পুরনো রেড ইণ্ডিয়ানদের বর্ণনার সঙ্গে । এরা কেউ খুব মদ খায়, কেউ জুয়া খেলে, কেউ কাশে, কেউ অদ্ভুত সব অসুখে ভোগে। মাঝে মাঝে ববদের রান্নাঘরে উঁকি মারে একটু খাবার আর আগুনের খোঁজে। দেখে মনে হয়না, এরাই আমেরিকার সেই সব জমি দখল করছে । মা কিন্তু খুব সহানুভূতি দেখান এদের। একদিনএদের কথায় মায়ের চোখে জল দেখেছে বব। । কখনও ববকে বলে ফেলেছেন, "সাদা মানুষরা যে এদের কী ক্ষতি করছে, তারা নিজেরাও জানেনা।"

বব প্রশ্ন করেছে---- "আমরাও তো সাদা মানুষ। আমরা তো ওদের ক্ষতি করিনা।"
সুজান দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন।
বলেছেন, ---"যা হওয়ার, আমরা এখানে আসার অনেক আগেই হয়ে গেছে । সব তোকে এখন বোঝানো যাবে না বব।... পুরনো ম ানুষদের একদিন হয়তো আর পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।" তখন সব বোঝেনি বব। বরং অবাকহয়েছে মা'র কষ্ট পাওয়া দেখে । ম া রেড ইণ্ডিয়ান নন। তবে... ?

এমন হাজারো জিনিস বুঝে না বুঝে, শুধুই তার বয়সী শহরে ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে দেখতে বব পৌঁছে গেল কলেজে পড় ার বয়সে। সিনিয়র ফ্ল্যাহর্টি তখন পুরোদস্তুর prospector . ইউনাইটেড স্টেট্স্ স্টীল ছাড়াও অন্য কয়েকটি শিল্প সংস্থা তাঁকে কানাড ায় খনিজ ধাতুর খোঁজে পাঠিয়েছে। ১৮৯৬ সালে, যখন ববের বারো , তখনই প্রথমবার তাকে সঙ্গে নিয়ে যান হেনরি ফ্ল্যাহার্টি। কত সপ্তাহে একটানা 'ক্যানো' (Canoe)য় চেপে যেতে হয়েছে। কত মাস ঘোড়ার পিঠে, কত মাস পায়ে হেঁটে--- তার ঠিক ঠিকানা নেই। ওই বয়স থেকেই বব পার হয়েছে অনেক দুর্গম জনমানবহীন উপত্যকা, জঙ্গল, পাহাড় নদী, বরফের দেশ। দেখেছে এস্কিমোদের । সভ্যজগতের খাওয়া শোওয়ার অভ্যেস ভুলে গিয়ে শিখেছে কীভাবে দিনের পর নি বেঁচে থাকতে হয় ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশে। বাব ার পাশে পাশে থেকে শিখেছে ভূগোল, জরিপের কাজ, পাথরের গায়ে খনিজ আকরের চিহ্ চিনে নেওয়া । শিকার করা। বন্য জন্তুর হ াত থেকে নিজেকে বাঁচানো। এবার তার সভ্যজগতের কেতাবী শিক্ষাটুকু হলেই সবদিক থেকে ভালো হয়। সেকথা ভেবে হেনরি তাকে প াঠালেন 'মিশিগান কলেজ অব মাইন্সে'। মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। কিন্তু এখানকার পরীক্ষায় বব পাশ করতে পারল না। কলেজ ভ াল লাগেনি তার। হেনরি সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী মানুষ। নিজেরভাগ্য তৈরি করেছেন নিজের হাতে। তিনি জানেন, চেষ্টা করলে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে ছাড়ে । তাই আর পড়াশুনোর জন্য জোর না করে, ববকে পরামর্শ দিলেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে । স্বাধীনভাবে কে ানো পেশা খুঁজে নিতে। কলেজের পরীক্ষার পড়া থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বব। যাক, সত্যিকারের জীবন শু হল তাহলে। কিন্তু কী কাজ করবে সে ? বাবার পেশার বাইরে অন্য কোন জীবিকাকে সে এত কাছ থেকে, এত বেশি করে জানেও না। আর যাতে অ্যা ডভেঞ্চার নেই, সেরকম কলমপেশা কাজ করতে ভালও লাগবে না তার।

আমেরিকার কাজকর্মের বাজারে তখন স্পেশ্যালাইজেশনের যুগ এসে গেছে। তরতরিয়ে বাড়ছে ভোগের সামগ্রী। সিনেমা এসে গেছে। অর্থনৈতিক রাজনীতির হাওয়ার নতুন নতুন শিল্পপতিরা নেমে গেছে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় এসেছে আধুনিকত ার চমক। এজরা পাউণ্ড, ইউজিন ও নীল, ডরোথি পার্কারদের কলমে জন্মাচ্ছেনতুন সাহিত্যের ভাষা। ছবি আঁকার চিন্তাভাবনা পাল্টে দিচ্ছেন জন স্লোয়ান, রবার্ট হেনরীর মত শিল্পীরা। কবিতায়, সংগীতে সর্বত্র আমেরিকান প্রতিভারা মুছে ফেলছেন তাঁদের পূর্বপুষের দীর্ঘলালিত ইউরোপীয় মানসিকতার ধারা। বিশ শতকের শুতে তখন পুরো উদ্যমে জেগে উঠছে নতুন আমেরিকান সমাজ। নিয়ম ভাঙ

ার এক অলিখিত নিয়মই যেন হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রকৃত আমেরিকানদের পরিচয়। এরই মধ্যে এদিক সেদিক খুঁজতে খুঁজতে একদিন সত্যিই নিজের মনের মতো কাজ পেয়ে গেল বব। ১৯১০ সালের অগাস্ট মাসে। তখন সে ছাব্বিশ বছরের সুন্দর এক যুবক নীল চোখ। বড়সড় লম্বা, পেটা চেহারা। দেখলেই মনে হয়, কিছু একটা করে ফেলবে। কঠিন যে কোনও কাজ।

কানাডা সরকার তখন রেললাইন বাড়ানোর কথা ভাবছে। পাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথ ঘটিয়ে ফেলেছে এক অর্থনৈতিক বিপ্লব । তাই কানাডাতেও শু হয়েছে বিশাল পরিকল্পনা। পশ্চিম কানাডা থেকে উত্তর - পূর্ব প্রান্তের'হাডসন বে' উপসাগর পর্যন্ত রেল পাতার কাজ পেয়েছেন সার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জি, কানাডার অধিকাংশ রেলপথ যাঁর হাতে তৈরি । সেখানেই কাজ পেল বব। তাকে 'হাডসন বে' অঞ্চলে খুঁজে বার করতে হবে খনিজ পদার্থ আর তৈরি করতে হবে সেইসব অপরিচিত অঞ্চলের মানচিত্র যা কাজে লাগবে রেলল াইন পাততে । অর্থাৎ একই সঙ্গে অভিযান, জরিপ ও আবিষ্কারের কাজ। প্রথম দায়িত্ব --- নাস্টপোকা দ্বীপ আর তার আশপাশের অঞ্চলে লোহার উৎস খুঁজে বার করা। সময় মোটামুটি এক বছর। বেঁচে বর্তে ফিরলে তারপর দেখা যাবে। বব অপেক্ষায় ছিল এমনই এক কাজের। যাত্রা শু করল সে। শু হল তার প্রস্পেক্টর জীবন। অনিশ্চিত, বিপদে ঘেরা কিন্তু লক্ষ্যে স্থির।

বছরখানেক পর ফিরল বব। প্রচুর তথ্য, অভিজ্ঞতা আর মানচিত্রের বোঝা নিয়ে। উন্গাভার বিশাল অপরিচিত অঞ্চল জরিপ করে ফেলেছে সে। লোহা ছাড়াও অন্যান্য খনিজ আকরের সম্ভাবনা এবং এইসব দুর্গম অঞ্চলে কাজ করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, রসদ সব কিছু সম্পর্কে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট দেখে সার ম্যাকেঞ্জি মহা খুশি। বব তো রীতিমতো হীরো! সিনিয়র ফ্ল্যাহার্টির নাম রেখেছে সে। জুনিয়ার ফ্ল্যাহার্টি। রবার্ট যোসেফ ফ্ল্যাহার্টি ! আবার ববকে পাঠালেন সার ম্যাকেঞ্জি এবার একটা হালকা পরামর্শ দিলেন ববকে। সেট া হল, অভিযানে যাওয়ার সময়ে সঙ্গে একটা মুভি ক্যামেরা নেওয়ার কথা। "You are going into interesting country----- Strange people-animals and all that ---why don't you include in your outfit a camera for making film ?"
ববের মনে ধরল কথাটা। লেখা বা স্কেচ করা Travelogue বা ভ্রমণবৃত্তান্তের জায়গায় জ্যান্ত ছবি! অসাধারণ। ক্যামেরা চালানো, ছবি প্রিন্ট করা ? সে না হয় শিখে নেওয়া যাবে। এসব ছবি তো 'হলে' দেখানোর জন্য তুলতে হবে না। যেমন তেমন হলেও একটা রেকর্ড তো রাখা যাবে । এত পরিশ্রমের, এত সাহসের । কেনা হল একটা 'বেল অ্যাণ্ড হাওয়েল' ক্যামেরা। ফিল্ম ডেভেলপ করা আর নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট নেওয়ার সাজ - সরঞ্জাম । নিউ ইয়র্কের রশেস্টার কলেজে তিনমাস সিনোম্যাটোগ্রাফির ত্রাশ কোর্সও করা হয়ে গেল। মুভি ক্যামেরার ছবি তুলে তাকে এডিট অর্থাৎ কাটা জোড়া ক'রে ফিল্ম বানাতে হয় তাও জানা হল ববের। সব কিছু তৈরি-- শু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
আমেরিকার ধনীরা উঠে পড়ে লেগে গেল যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ পয়সা কামাতে । যুদ্ধের প্রয়োজনে নানা জিনিস আবিষ্কার হল। তৈরি হল নতুন নতুন প্রয়োজনের ও আরামের পশরা। টাকা উড়তে লাগল হাওয়ায়। সাধারন মানুষও মেতে উঠল নানারকম বিনিয়োগ অ ার ফাটকার খেলায়। এই হাওয়ায় ম্যাকেঞ্জির মনও ঘুরে গেল যুদ্ধবাজারের দিকে। অভিযানের চিন্তা রইল টাকার সিন্দুকের তলায় চ াপা প'ড়ে। ম্যাকেঞ্জিকে অভিযানের গুত্ব বোঝাতে কিছুদিনসময় নষ্ট হল বটে, কিন্তু শেষমেষ তিনি বুঝলেন। জুনিয়র প্যাহার্টির কথা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতোও নয়।জাহাজ যোগাড় করার একটু অসুবিধা ছিল। সেটাও হ'য়ে গেল। 'মুজ' ফ্যাক্টরিতে পড়ে ছিল 'ল্যাডি' নামে একটা জাহাজ---সেটা কাজে লেগে গেল। যুদ্ধের মধ্যেই বব রওনা দিল 'বেলচার' দ্বীপের দিকে। সঙ্গে ক্যামেরা। প্রায় বছর খানেক ধরে চলল জরিপ করা, খনিজ ধাতু খোঁজা আর ছবি তোলা। আসল কাজের চেয়ে অনেক বেশি নেশা ধরাল এই ছবি তে ালা। মাঝে মাঝে ম্যাপ বানানোর চেয়ে ছবি তোলাতেই বেশি মজে থাকল সে । হাজার হাজার ফুট ফিল্মে বরফ আর এস্কিমোদের ছবি তুলে ঘরে ফিরল। কিন্তু মন ভরল না তার। কত কীই যেবাকি রয়ে গেল। চতুর্থবার অভিযানের জন্য রসদ যোগাড় করতে হবে। এদিকে ফ্রাঁসেজকেও ফেলে থাকতে ইচ্ছে করছে না। ১৯১৪ -র নভেম্বরে নিউ ইয়র্কে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। ফ্রাঁসেজ হার্বাড হয়ে গেলেন ফ্রাঁসেজ হার্বাড ফ্ল্যাহার্টি। ববের পকেট তখন একেবারে খালি। ফ্রাঁসেজকেই কিনে দিতে হল বিয়ের আংটিটা। ম্যাকেঞ্জির বাকি কাজ শেষ করতে স্বামী - স্ত্রী উঠলেন জাহাজে।

এবারে বব আরও বেশি ক্যামেরা - পাগল হয়ে উঠল। অদ্ভুত অদ্ভুত উপায়ে, সম্ভব অসম্ভব জায়গা থেকে ক্যামেরা চালাতে লাগল সে। ফিল্ম ডেভেলপিং, প্রিন্টিং, এডিটিং সব নিজের হাতে। এবারের অভিযানে এসে সে ছবি তুলেছে আরও উত্তরের দুর্গম অঞ্চলের । এস্কিমে াদের। দুর্লভ সে সব ছবি। সংগ্রহ করে এনেছে এস্কিমোদের আঁকা অনেক সাদা কালো ড্রইং । টরন্টোয় বসে ফ্রাঁসেজ তাঁর ডায়রিতে লিখছেন----
"February 1, 1915.
Moving pictures still the undercurrent of life. Printing almost finished and editing begun. R. Refuses to let

me see them until the first edition is in shape…. R. Is full of the idea of the use of moving picture in education, in the teaching of geography and history. Someone might will make it a life work. Why not we ?

কয়েক সপ্তাহ পর থেকে বব দেখাতে শু করল তার তোলা ছবি। একটানা লম্বা ফিল্মের মতো নয়। টুকরো টুকরো ঘটনা ও ভ্রমণের চলচ্চিত্র ।কেমনলাগলো এই দেখা ?

প্রথম দর্শনে সবই মুগ্ধ। ওন্টারিওর পুরাতত্ত্ব মিউজিয়মের ডিরেক্টর সি.টি. কারেলী চিঠিতে জানালেন,

"I cannot too strongly congratulate you on the moving pictures you exhibited in the convocation Hall. They are much the best I have ever seen.

… I have never known anything received with greater enthusiasm.

টরন্টোর আর এক দর্শক তাঁর পরিচিত কাউকে ববের হয়ে সুপারিশ করে চিঠি লিখবেন নিউইয়র্কে।---

"This will introduce Mr. Robert J. Flaherty of Toronto, who has a most interesting series of ethnological moving pictures of Eskimo Life, which show the primitive existence of a people in the way they lived before being brought in contact with explorers. He is looking to bring them out in the best way. I know you are thoroughly in touch with the moving picture game from the inside and can at least give him some pointers. Do what you can…".

দুটি চিঠিই ১৯১৫ সালে মার্চ - এপ্রিলে লেখা। ববের ইচ্ছে আরও কাটছাঁট করে ছবিটি দেখানো। পুরোটা দেখাতেগেলে একটানা স াড়ে সতেরো ঘন্টা সময় লাগবে। ফ্রাঁসেজও লেগে গেলেন এডিটিংয়ের কাজে। ১৯১৬ সালে নিউইয়র্কে একটা বিশেষ শোয়ে ছবিটি দেখানোর আমন্ত্রন পাওয়া গেল। মোটামুটি সিনেমা হলে দেখানোর সময়সীমায়যতটা সম্ভব বেঁধে ফেলা গেল ছবিটিকে। ফিল্মের ফ াইন্যাল প্রিন্ট জাহাজে ওঠার জন্য তৈরি। ঠিক সেই সময়ে ববের সিগারেট সব ভণ্ডুল করে দিল। টেবিলের কোণায় রাখা ছিল জ্বলন্ত সিগারেট। আচমকা তা গড়িয়ে এসে পড়ল নীচেয় মেঝেতে ছড়ানো বাতিল করা ফিল্মের স্তূপে । কয়েক মিনিটের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল ৩০,০০০ ফুট ফিল্ম। তিন বছরের পরিশ্রমকে ওইভাবে জ্বলতে দেখে বিশ্রীভাবে পুড়ল হাতদুটোও। শুধু বেঁচে গেল ফিল্মের একট া work print যা থেকে আবার নেগেটিভ বানানো সেই যুগে সম্ভব ছিলনা।

সাধারণ মানুষ হলে হয়তো, এই শোকেই ফি ল্ম বানানোর আশা ছেড়ে ফিরে যেতো অন্য কোনও স্বপ্নে। কিন্তু বব অন্য জাতের। সে বলল, ‘‘ভালোই হয়েছে । ফিল্মটা যা হওয়া উচিত ছিল তা মোটেই হয়নি। ওটা নতুন করে তোলা উচিত আবার।’’ কারন, তার ভেতর তখন জেগে উঠেছিল এক অন্য শিল্পীসত্তা। যার হাতে তৈরী হতে পারে বিশুদ্ধ চলচিত্র। যার চোখ দিয়ে মানুষ দেখতে পারে প্রকৃতি ও ম ানুষের চিরকালীন সংঘর্ষের প্রকৃত রূপ। প্রস্‌পেক্টর ববের খোলস ছিঁড়ে বেড়িয়ে আসছিলেন তথ্যচিত্রের কাব্যকার রবার্ট যোসেফ ফ্ল্য াহর্টি। তাঁর মনে হচ্ছিল এই তিন বছরের পরিশ্রমে আসলে কোনও ফিল্মই তৈরি হয়নি। যা তৈরি হয়েছিল, তা ভ্রমণবৃত্তান্ত ব া Travelogue এর ফোটোগ্রাফির অতিত্তি কিছু নয়--- "a scene of this and that. No relation, no thread." তা হলে কী হওয় া উটিত ? ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ আলোচনায় ডুবে রইলেন বব আর ফ্রাঁসেজ। শেষে ঠিক হল, এবারে একটিএস্কিমো পরিবারকে কেন্দ্র করে ছবি তোলা হবে। তোলা হবে বরফের রাজ্যে তাদের বেঁচে থাকার বিচিত্র কাহিনী। একটাpoint of interest না থাকলে দর্শকের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে না। এত উত্তেজক আর দুর্লভ ঘটনার ছবি থাকলেও, পুরো চলচিত্রে দর্শকের ঔৎসুক্য দানা বাঁধছে না কোথাও । বরং ঘটনাক্রম এমনভাবে আসা উচিত যাতে গল্পের রেশ থাকে। একটি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে গেলে মানুষ যেন অধীর অ াগ্রহে অপেক্ষা করে, এবার কী ঘটবে তা দেখার অপেক্ষায় । নির্বাক সিনেমার দর্শককে শুধু ঞ্চত্তব্ধনন্ধপ্তন্দ নয়, লিখিত Text ছাড় াও Visual Text দিয়ে বসিয়ে রাখতে হবে। সে তো সেই মুহূর্তে বসে আছে একটা অন্ধকার ঘরে। বরফের প্রান্তরে ব্লিজার্ড (বরফ ঝড়) এর মাঝে নয়। কাজেই তার শারীরিক অনুভূতি দিয়ে সে কী করে বুঝবে পর্দায় দেখানো দৃশ্যের সঠিক পরিবেশ ?

Illusion making বা দৃশ্যমায়া তৈরির প্রাথমিক শর্তই হল দর্শককে সাময়িকভাবে দৃশ্যের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া। সে ভুলে যেতে বাধ্য হবে তার চারপাশ। তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে শুধুই পর্দার ছবি। ব্যাপারটা অবাস্তব হলেও সিনেমার বাস্তবতা এইরকম। ফিল্ম তাত্ত্বিক মার্টিন জে তাঁর "Scopic Regime of Modernity" তে এটাকেই দর্শকের Transcendental state বলেছেন। অর্থাৎ দর্শক তাঁর আসন থেকে মানসিকভাবে পৌঁছে যাবে পর্দার ভিতরের জগতে। শারীরিকভাবে তিনি তখন বিচরণ করবেন ওই পরিবেশে। আঁকা ছবি হোক আর সিনেমার পর্দাই হোক, সবই চারচৌকো ফ্রেমে বাঁধা, flat--- দ্বিমাত্রিক। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। কিন্তু painting বা film বাস্তব ও স্বতঃস্ফূর্ত হলে দর্শক তাঁর অজান্তে ফ্রেমের বাধা ভেঙে তার মধ্যে ঢুকে পড়েন অনুভূতি দিয়ে । তখন

এইদ্বিমাত্রিক ছবিই হয়ে ওঠে ত্রিমাত্রিক। ছবিও তার ফ্রেমের সীমানা ভেঙে বেরিয়ে আসে বাইরে। ছড়িয়ে পড়ে দর্শকের চারপাশে। ছবি ও তার দর্শক---দু'য়ে মিলে গড়ে ওঠে এক মায়ার জগৎ । যাঁরা ক্যানভাসে, কাগজে ছবি আঁকেন এবং যাঁরা দেখেন, তাঁদের এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা খুব পরিষ্কার। কিছু ছবির ভেতর আমরা ঢুকে যাই। তারা আমাদের চারপাশটাকে গ্রাস করে দেখার সময়টুকু। আঁকার সময়েও । না-দেখার সময়েও তারা ছেয়ে থাকে আমাদের চেতনা । কিন্তু দেখার সময়টাই আসলে transcendental, আমাদের শরীর ও চারপাশ থেকে বেরিয়ে আসা। অন্যভাবে বলা যায়, ছবিই বেরিয়ে আসে আমাদের জগতে, আমরা ঢুকে পড়ি ছবির ফ্রেমের ওপারের দুনিয়ায়। সিনেমা চলমান ছবি। তার শব্দ, গতি বিশ্বাসযোগ্যতার ফলে এই transcendentality চলে শু থেকে শেষ পর্যন্ত। আমাদের মনে তার অভিঘাতও থাকে দীর্ঘক্ষণ। একটি ভালো চলচ্চিত্র দেখার পর আমরা বহুক্ষণ তার মধ্যে থাকি। সিনেমা হলের বাইরে বেরিয়ে এসেই কিছুটা সময়ে বাইরের পরিবেশটা অলীক মনে হয়। কীসের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি----তা বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লাগে। সময় লাগে ওই transcendental reality থেকে বেরিয়ে আসতে। থিয়েটারের স্টেজেও এই অবস্থা হয় অভিনেতা অভিনেত্রীর । অভিনয় শেষ হওয়ার পরে, শম্ভু মিত্রের ভাষায়, 'অনেকক্ষণ তাঁরা সুদূর হ'য়ে থাকেন'। ফ্ল্যাহার্টিও চাইছিলেন দর্শককে এই সুদূরের স্বাদ দিতে।

অর্থাৎ নতুন করে ভাবা। নতুন করে ছবি তোলা। কিন্তু ছবি তুলতে গেলে যেতে হয় আর এক অভিযানে। উইলিয়ামম্যাকেঞ্জি আর রাজী নন অভিযানে । আগুন লাগার ঘটনায় একটু থমকে গেছেন তিনি। একবার তো হাত পুড়েছে, এবার হয়তো জাহাজ টাহাজও পুড়িয়ে আসবেন ফ্ল্যাহার্টি---এমনই ধারণা হয়েছে তাঁর। যে মানুষকে সিনেমার ভূতে ধরেছে তার পিছনে অর্থব্যয় না করে টাকাগুলো হাডসন বে'তে ফেলে দিলেও ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়। বড়লোকের মর্জি! আর পারলেন না ফ্ল্যাহার্টি তাঁকে রাজি করাতে। অগ্নিকাণ্ডের পর যে Work print আর আগেকার কিছু ছুটকো ছাটকো ফিল্ম বেঁচেছিল তা দেখিয়ে সিনেমা কোম্পানীগুলোকে প্রস্তাব দিতে থাকলেন এস্কিমোদের উপর একটি অসাধারণ চলচ্চিত্র তৈরির। কেউই আমল দিল না।

পরবর্তী ফিল্ম ছাড়াও বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অর্থের। স্বভাবেও কৃপণ নন ফ্ল্যাহার্টি। যেমন পারেন প্রচুর মদ্যপান করতে, তেমনই চেন - স্মোকার। শখের জিনিস, বইপত্র কেনার সময়ে চিন্তা করেন না, পরের দিনের বাজার খরচটুকু রইল কিনা। ফ্রাঁসেজ এ নিয়ে কখনও আপত্তি করেন নি। সব সময়েই উৎসাহ দিয়ে গেছেন ববকে। এইনীলচোখ দীর্ঘদেহী কঠোর পরিশ্রমী মানুষটির মন পৃথিবীর সব সমুদ্রের চেয়ে বড়। বরফগলা উত্তর সাগরের জলেরচেয়েও স্বচ্ছ। সেখান ডুব দিয়েই আনন্দ ফ্রাঁসেজের। ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল ---- পাঁচ বছরে তাঁর কোলে এসেছেফুটফুটে তিনটি মেয়ে। নীল চোখের তিনটি পরী যেন। এই পরীদের দিকে চেয়ে বব আরও উঠে পড়ে লেগেছেন টাকা উপার্জনে। সচিত্র লেকচার দিচ্ছেন। কখনও ভ্রমণস্মৃতি লিখে দিচ্ছেন। কিন্তু যে টাকাই আসুক না কেন, তা নিমেষের মধ্যে সংসারের খরচ আর ধারদেনা মেটাতেই যাচ্ছে অদৃশ্য হয়ে। এস্কিমোদের উপর ফিল্ম করার প্রস্তাব সেই সময়ে সকলের কাছেই বাতুলতা মনে হচ্ছে। বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়া আর হাঙ্গেরীর বিপ্লব, স্প্যানিশ ফ্লু'এর মহামারী,রক্তাক্ত বাংকার, বিধবস্ত শহর---এই বাস্তব দুঃস্বপ্নের মধ্যে বসে যিনি বরফের রাজ্যে এস্কিমোদের সাদাকালো স্বপ্নে ডুবে থাকেন, তিনি আর যাই হোন স্বাভাবিক মানুষ নন। তথাকথিত স্বাভাবিকদের চোখে তিনি দুর্বোধ্য। ফ্রাঁসেজের বাড়ির লোক তাঁকে পরামর্শ দেন Ford গাড়ির এজেন্সি নিতে।শ্বশুরবাড়ির চোখে ফ্ল্যাহার্টি তখন এক মধ্যতিরিশের শেষে হেরে যাওয়ার মানুষ। কণার পাত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধ থামল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮-র এই ঝড়ে উল্টোপাল্টে গেছে অনেক ছক। যুদ্ধের আগে প্রায় অস্তিত্ব ছিল না, এরকম বহু কোম্পানী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিশ্বাজার। তাদের হাতে এসেছে উদ্বৃত্ত অর্থ। নানাভাবে ব্যয় ক'রে তা থেকে বিচিত্র ধরণের লাভ তুলতে চায় তারা। এরকমই এক ন্দ্রত্তজ (পশুলোম) কোম্পাণী 'রেভিল্লঁ ফ্রেরে' পরোক্ষ বিজ্ঞাপনে (indirect advertising) কাজে লাগানোর জন্য ফ্ল্যাহার্টির ফিল্মের পুরনো প্রস্তাবটি নতুন করে ভেবে দেখলেন । টাকা পয়সার ব্যাপারেও কথা পাকা হল। খুলে গেল স্বপ্নের প্রথম দরজা। ১৯২০ সালে ফ্ল্যাহার্টি আবার রওনা হলেন উত্তরে।
এবার সঙ্গে নিয়েছেন 'একিলি' ক্যামেরা---খুব ঠাণ্ডাতে যা সচল থাকে । আর নিয়েছেন Gyro Tripodএই নতুন ধরণের তেপায়া স্ট্যাণ্ডের উপর অতি সহজে মসৃণভাবে ক্যামেরাকে Tilt (মুখ তোলা ও নামানো) এবং Pan (অনুভুমিকভাবে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরানো০ করা যায়। হাডসন বে নখদর্পনে থাকলেও শ্যুটিংয়ের Location পছন্দ করে আস্তানা গাড়তে দুমাস লেগে গেল তাঁর। হাডসন বে'র উত্তরপূর্ব তীরে উত্তর সাগরের লাগোয়া এক অঞ্চলে। এস্কিমোদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে সময় লাগল না। এই সরল মানুষগুলোও কয়েকদিনে আপন করে নিল ফ্ল্যাহার্টিকে।দেখা হল নানুকের সঙ্গে। 'ইটিভিমুইট' উপজাতির সবচেয়ে বড় শিকারী সে। সর্দার গোছের। কিছু ফিল্মের প্রোজেকশন দেখে ফিল্মের প্রেমেই পড়ে গেল সে। ববের মতো তারাও তোলা হল ওয়ালরাস (walrus) শিকারের ছবি। সঙ্গি-সাথীদের বুঝিয়ে দিল কী কী করতে হবে। সাদা মানুষ আর তার বন্দুক আসার আগে যেভাবে তারা শিকার করতো হারপুন

দিয়ে। ফ্ল্যাহার্টি এই নানুককে করলেন মূল চরিত্র। 'নানুক' তার পরিবার ও সঙ্গিসাথীদের সঙ্গে কীভাবেজীবনধারণ করে মেপ্রদেশে--- হল ছবির বিষয় । শ্যুটিং শু করার আগে পইপই করে বোঝালেন নানুককে তাঁর উদ্দেশ্য । শিকারের উৎসাহে তাঁর ছবি তোলা যাতে নষ্ট না করে ফেলে তারা।

---- "Will you remember that it is the picture of you hunting the 'Ivuik' that I want, and not their meat?"
---- "Yes, yes" Nanook assured him," The aggie will come first."
---- (Griffith: The world of Robert Flaherty. P. 38)

পেন্সিলে লেখা অসংখ্য সংক্ষিপ্ত শব্দে ভরা ডায়রির পাতায় ফ্ল্যাহার্টি লিখে রাখতেন রোজকার ঘটনা। লিখতেন ইংরেজির এস্কিমো প্রতিশব্দ। যেমন, "Again: poonuk." ----ছবি তোলার জন্য ওঁকে কতবার এই "পূনুক, পূনুক" বলতে হয়েছিল কে জানে। এখানে অ াসার ছ'সপ্তাহ পরে ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২০, ,সালের ডায়রিতে লেখা----

"It has been the day of days. Morning came clear and warm. Some Twenty walrus lay sleeping on the rock. Approached to within 100 ft & filmed with telephoto lens. Nan stalking quarry with harpoon---- within 20 ft they rose in alarm and tumbled towards the sea. Nan's harpoon landed but the quarry succeeded in reaching the water. Then commenced a battle royal----& Esk straining for their lives on the harpoon line at water's edge—this quarry like a huge fish floundering--- churning in the sea—The remainder of the herd hovered around – their "ok ok!" resounding – one great bull even came in to quarry &locked horns in attempt to rescue—I filmed and filmed and filmed ---The men calling me to end the struggle by rifle—so fearful were they about being pulled into the sea."

প্রায় একশ ফুট দূর থেকে ঘুমন্ত ওয়ালরাসদের ছবি তোলা পর্যন্ত কোনও সমস্যা ছিলনা। নানুক চুপিসাড়ে এগিয়েওযাচ্ছিল শিকারের দিকে। সে যখন শিকার থেকে প্রায় ২০ ফুট দূরে, তখন টের পেয়ে গেল ওয়ালরাসের দল । ঝুপঝাপ নেমে পড়ল সমুদ্রের জলে। ন ানুকের হারপুন যেটার গায়ে বিঁধেছে সে বিশাল মাছের মত তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল। আর একটা বিশাল ওয়ালরাস এসে ত ার উল্টো শিংএর মতো ঝুলে থাকা বড় বড় দাঁতদুটো গলিয়ে দিল হারপুন আর দড়ির মাঝখানে। শিকার হওয়া ওয়ালরাসকে হ ারপুন থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেওবিপদে পড়ে গেল সে। ওয়ালরাস টানছে গভীর জলের দিকে। আর হারপুনের দড়ি ধরে তীরে থেকে টানছে এস্কিমোদের দল। বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন। সেখানে প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া ওয়ালরাস আপ্রাণ শক্তিতে মানুষগুলোকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে জলের দিকে। ফ্ল্যাহার্টির কাছে রাইফেল থাকলেও তিনি সেটি হাতে নিতে নারাজ। এস্কিমোরা চীৎকার করে তাঁকে বলছে গুলি চালিয়ে ওয়ালরাসটাকে মেরে ফেলতে, না হ'লে সদলবলে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে তারা। প্রাণ বাঁচাতে তারাও শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হারপুনের দড়ি টেনে যাচ্ছে। শু হ'য়ে গেল বাঁচা মরার লড়াই। এস্কিমোদের ভয়ার্ত মুখ, ক াতর আর্তনাদ সব শুনেও না শোনার ভান করে ফ্ল্যাহার্টি চালিয়ে গেলেন ক্যামেরা। পৃথিবীতে প্রথম এমন একটি বিপজ্জনক দৃশ্যের অ াগাগোড়া বাস্তব চলচ্চিত্রায়ণ হল। শিকারের অভিনয় নয়, সত্যিকারের শিকার। প্রাণভয়ে ভীত হওয়ার মুখভঙ্গী নয়, সত্যিকারের প্রাণ বাঁচানোর মরিয়া প্রচেষ্টা । কাটাকাটা Action shot জুড়ে দৃশ্যগত উত্তেজনা বাড়ানো নয়। জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে ক্যামেরা ওএডিটিংয়ের যাদুতে তৈরি ফিল্ম সাসপেন্স নয়। আগাগোড়া সত্যি ঘটনায় ছবি। দুর্জয় প্রকৃতিকে মানুষের জয় করার চিরকালীন কা হিনী। রচনা হল বাস্তববাদী তথ্যচিত্রের প্রথম মহাকাব্য। 'তথ্যচিত্র' শব্দটির প্রচলন নেই তখনও। শু হয়নি ফীচারফিল্ম (কাহিনীচিত্র) আর 'ডকুমেন্টরি' (তথ্যচিত্র) ফিল্ম নিয়ে বর্ণভেদ বা কৌলিন্যের বিবাদ। সে সময়ে সবই ফিল্ম। আলাদ করে 'তথ্যচিত্র' শব্দটি উঠে আসে পরবর্তীকালে ১৯২৬-২৭ সালে। ফ্ল্যাহার্টির দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'মোআনা' (সামোয়ার জীবনযাত্রার ছবি) সম্পর্কে 'নিউইয়র্ক সান' পত্রিকায় প্রশংসায় ভরা এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন জন গ্রিয়ারসন---'মুভিগোয়ার' (Moviegoer) ছদ্মনামে। "Moana, being a visual account of events in the daily life of a Polynesian youth, has documentary value." ----'ডকুমেন্টরীর' শব্দটি এর পরে ধীরে ধীরে Non-fiction film এর লেবেলে পরিণত হয়। গ্রিয়ারসন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন ফরাসী 'দকুমঁন্তেয়ার'কথাটি মাথ ায় রেখে। সুচিন্তিত ভ্রমণ ও অভিযানের আলেখ্য--- বাজে ভ্রমণকাহিনীর ঠিক উল্টো যা বোঝাতে ফরাসী ভাষায় শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করে।

ওয়ালরাস শিকার ঠিকমতো তোলা গেলেও পুরো ছবিটি তুলতে একের পর এক বাধার মুখে পড়ছিলেন ফ্ল্যাহার্টি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সেলুলয়েডের ফিল্ম শক্ত মুচমুচে কাঁচের ওয়েফারের মতো হয়ে গেল অনেকবার। ক্যামেরা বন্ধ করে দিতে হল ছবি তোলার মাঝপথে। অনেক দূর দূরান্তে যেতে হল কিছু ঘটনার ছবি তুলতে। একবার নানুকের মাথায় এল polar bear (মের ভালুক) শিকার করার অ

াইডিয়া। এরকম দুর্লভ দৃশ্য পাওয়ার আশায় কয়েক সপ্তাহ ধরে সকলে ঘুরতে থাকল বরফের পথে। খালি পড়ে থাকা ইগ্লু (বরফ দিয়ে তৈরি এস্কিমোদের বাসা) খুঁজে পেয়ে, তাতেই আশ্রয় নিতে হল পুরো দলকে। বরফের তীব্র ঝড়ে বাইরে রেরনোর উপায় নেই। বদ্ধ ইগ্লুর গোল বরফের ছাদ ভ'রে গেল ক্রমাগত জ্বলতে থাকা হাত - পা সেঁকা আগুনের ধোঁয়ার ভুষো কালিতে। একসময়ে উত্ত াপে গলে ছাদ থেকে ঝরতে লাগল কালো কালো জলের ফোঁটা। আগুন জ্বলার জিনিষপত্র শেষ হ'য়ে গেল ফিল্মের বাড়তি স্টক পুড়িয়ে জ্বালিয়ে রাখা হল আগুন। কোনো মতে প্রানে বেঁচে ফিরলেন ফ্ল্যাহার্ট। ভালুকের দেখা পাওয়া গেলনা। তোলা হ'লনা ভালুক শিকারের ছবিও।

ইগ্লু তৈরির বিখ্যাত দৃশ্যটি তুলতে গিয়ে আর এক মজার অভিজ্ঞতা। সাধারণত ইগলু খুব ছোট হয়। তার ভেতরেকোনওরকমে গুঁড়ি মেরে ঢোকা যায়। নানুকদের বলা হল বেশ বড়ো আকারের একটা ইগ্লু বানাতে, যাতে ক্যামেরা নিয়ে ফ্ল্যাহার্টি তার ভেতর ঢুকতে প ারেন। কিন্তু বানানো শেষ হওয়ার মুখে বসে পড়ল ছাদটা। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ইগ্লু খাড়া হলেও তার ভেতরে এত কম আলো যে ছবি তোলা সম্ভব নয়। তখন তার আধখানা কেটে সরিয়ে ফেলা হল। যথেষ্ট দিনের আলোয় তার ভেতরের স্পষ্ট ছবি পাওয়া সম্ভব। এবার এস্কিমোদের শুতে যাওয়ার যেরকম নিয়ম, সেইভাবেই নানুকরা সপরিবারে বিবস্ত্র হ'য়ে একটা বিশাল লোমশ চামড়ার তলায় ঢুকে মুখটুকু বারকরে ঘুমিয়ে পড়ার অভিনয় করল। আবার সকাল হ'লে যেভাবে রোজ বেরিয়ে এসে সকলে লোমে ঢাকা চামড়ার পে াষাক প'রে নেয়, সেভাবেই ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিল বাইরে বের হওয়ার জন্য। এই পুরো শ্যুটিংটাই হল আধখানা ইগ্লুর interior এ। অনেকটা অ্যাউট ডোর তৈরি সেটের মতো। এই এতটা সময় 'নানুক' তার স্ত্রী 'নাইলা' আর বাচচাকাচচারা সহ্য করল খোলা প্রান্তবের হু হু ববফের হাওয়া। ছবিতে তাদের এই কষ্ট সহ্য করাটা দেখা যাবে না। দেখে মনে হবে যেন, তারা ইগ্লুর আশ্র য়ে বেশ আরামেই ঘুমিয়ে আছে। Aggie-র জন্য নানুক যে কীসহ্য করেছে আর কীই না করেছে, তা জানেন শুধু ফ্ল্যাহার্টি । তাঁর মাঝে মনে হয়েছে, নানুক যেন তাঁর নিজের মানস আত্মারই এস্কিমো রূপ। নানুকেরও মনে হতো, বব আসলে একজন সাদা চামড়ার এস্কিমো। না হ'লে কে পারে এইভাবে একটা aggieর জন্য প্রাণ হাতে করে বরফের রাজ্যে পড়ে থাকতে? একদিন দু'দিন নয়। ষোলোটা মাস !ন ানুকের ছোট ছেলেটা কদিনে দেখতে দেখতে খানিকটা বড়োই হয়ে গেল।

ছবি তোলার পর মাসের পর মাস ফেলে রাখলে ফিল্ম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই নেগেটিভ ডেভেলপিং, ফিক্সিং এসব নিজের হাতেই করতে হতো ফ্ল্যাহার্টিকে। সভ্য জগতে ফেরার অপেক্ষায় না থেকে । সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো নানুকের দলবল। aggie -র অনেক ব্যাপারস্যাপার শিখে গিয়েছিল তারা। ক্যামেরা গুছিয়ে রাখা, স্ট্যাণ্ডে ফিট করা সবই করতে পারতো । ফিল্ম প্রসেস করতে গেলে প্রচুর জলের দরকার হয় । একটা বরফের চাঙড়ে গর্ত করে, তাতে পরিষ্কার বরফগলা জল ভরে স্লোতে চাপিয়ে নিয়ে আসতো ফ্ল্য াহার্টির বাসায়। ক্রমাগত জল টেনে এনেওয়াশ - ট্যাংকে কয়েক টন জল ভরে দিয়েছিল তারা। সেই জলকে লোম, ফারকোটের লোম, ঘরের বিছানায় পাতা চামড়ার বড় বড় লোম---সব দেখা যেত ওই জলের ট্যাংকে। এই লোম ফিল্মের চটচটে ইমালশনে আটকে গেলে বিশ্রী ব্যাপার। খোঁচাখুঁচি করলে ইমালসনে দাগ পড়ে যাবে আর আটকে যেতে দিলে নেগেটিভ তৈরির পর তা থেকে লোম বেছে ফেলে দেওয়া। নেগেটিভ তৈরির পর তা থেকে আর একটি ফিল্ম প্রিন্ট নিয়ে পজিটিভও তৈরি করলেন ফ্ল্যাহার্টি। তাঁর আনা জেনারেটারে বিজলী এত ওঠা নামা করছিল যে নেগেটিভ প্রিন্টিংয়ের জন্য একটানা স্থির আলো পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা সূর্যের আলোই ভরসা। স্ু দিয়ে ঘরের দেওয়ালে আটকানো হল প্রিন্টিংয়ের যন্ত্র । ৩৫ মিলিমিটার ফিল্মের একটা ফ্রেমের আকারে ছোট্ট গর্ত করা হল দেওয়ালে, ঠিক যেখানে প্রিন্টিং বাল্বের আলোটা থাকতো। আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দু'এক টুকরো অর্ধস্বচ্ছ মনলিমন জাতীয় কাপড়। এইভাবে ঘরের দেওয়ালের ফুটো দিয়ে আসা আলোর করা হল প্রথম প্রিন্ট বা Rush Print. মে বরফের আদি বাসিন্দ াদের জীবনযাত্রার প্রথম প্রামাণ্য চলচিচত্রের জন্মের উপযুক্ত আঁতুড়ঘর বব আর নানুকের প্রথম সন্তানের। দুনিয়া কাঁপানো 'Nanook of the North' এর।

জন্মের পর নবজাত সন্তানকে ঘিরে হাজারো স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের ঘোরে মশগুল বব আর নানুককে মাঝে মাঝেই দেখাযেত চুপচাপ হাডসন বে'র তীর ধরে হেঁটে যেতে। এক গ্রীষ্মের সকালে হাঁটতে হাঁটতে, ঘরে ফেরার পথে বব নানুককে বলতেন তাঁর স্বপ্নের অনুভব ---এই অগুন্তি নুড়িপাথরের চেয়েও বেশি, অনেক অনেক মানুষ যেন সারা পৃথিবীতে অপেক্ষা করে রয়েছে তাঁদের দেখার অপেক্ষায়। পর্দার এপারে বব আর ওপারে নানুককে।

১৯২১-এর শাতে এডিটিং শেষ হল। চাল্র্স গেল্ব্ এর সহযোগিতায় এডিটিং শেষ ফাইন্যাল প্রিন্টে সাব টাইট্ল্ জুড়ে ১৯২২এ তৈরি হল 'নানুক অব দি নর্থ'। প্রথমেই দেখানো হল প্যারামাউন্ট পিকচার্সকে। মহাযুদ্ধের হিড়িকে ফ্রান্সের ফিল্ম তৈরি প্রায় বন্ধ।

ইংলেণ্ড আর ইতালিতে পুরোপুরিই । চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় যোগানদার ফ্রান্সের চেয়ার এখন আমেরিকার দখলে। প্রচুর প্রযোজক, বিতরক, শো হাউস আমেরিকায়। বিশ্বের বাজার প্রথম মহাযুদ্ধেরপর তাদেরই হাতে। এরকম এক রাঘব বোয়ালParamount. তাদের দেখিয়ে হতবাক হ'য়ে গেলেন ফ্ল্যাহার্টি। ১৯৫১ সালের Theatre Arts পত্রিকার 'মে' মাসের সংখ্যায় রয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। শো'য়ের শেষে খুব অল্প সংখ্যক দর্শক বসে ছিল। বাকীরা হল ছেড়ে উঠে গেছেন শো শেষ হওয়ার আগেই। এবার আসল কর্তার মত ামত। "The manager came up and very kindly put his arm around my shoulders and told me he was terribly sorry, but it was a film that he tried to do such things before and they had always ended in failure. He was very sorry indeed that I had gone through all that hardship in the North, only to come to such an end, but felt that he had to tell me and that was that."

আরও চারজন নামী Distributor (বিতরক) ছবিটি দেখলেন। সবারই সেই এক মত--- কমার্শিয়াল নয়। কোনওরকম মশলা নেই না কি। আসলে সকলে ভেবেছিলেন, দর্শকচির শেষ কথাটা তাঁরাই বোঝেন। এদিকে হলিউডের উদ্ভিন্ন যৌবন, ওদিকে সারা বিশ্বের বাজার ফেলা আমেরিকান ফিল্ম থেকে আসা ডলারের আঁচে হাত সেঁকতে তাঁদের বিশুদ্ধ শিল্প চেনার ক্ষমতাটা ভোঁতা হয়েছিল। Slapstick comedy -র সহজবোধ্যতা অথবা Baroque জাঁকজমকের মাঝে প্রেম ও শৌর্যবীর্যের অনায়াস আস্ফালন তাঁদের বিনিয়োগকে দিয়েছিল নিরাপত্তা। ব্যাঙ্ক ব্যালান্সবাড়ছিল চত্রবৃদ্ধি হারে। তার মধ্যে এইরকম একটি ছবির কী প্রয়োজন ? কুড়ি বছর ধরে অভিযান চা লিয়ে, দশ বছর ধরে ফিল্ম নষ্ট করে, হাত পুড়িয়ে সাদা সাদা বরফ আর কতকগুলো আদিবাসীর শিকার করার ছবি কেনইবা তুলছে লোকটা ! এ ধরণের দৃশ্য হলিউডের স্টুডিওতে তো অনায়াসে তুলে ফেলা যায় কয়েকদিনে।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফ্ল্যাহার্টিকে কিন্তু ফেরালনা 'প্যাথে' কোম্পানী। 'রেভিল্ল' ফ্রেরে'র মতো এটিও মূলত ফরাসী প্রতিষ্ঠান।ছবি তুলতে ফর াসীদের টাকা, দেখানোতেও তাদের সাহায্য। ফরাসী টির কাছে অনেক ঋণী আমেরিকার প্রতিভা ফ্ল্যাহার্টি। ১৯২২ সালের এগারোই জন নিউইয়র্কের Capitol থিয়েটারে প্রথম দেখানো হল ''নানুক অব দি নর্থ''।
আর কয়েকদিনের মধ্যে জনপ্রিয় শুধু নয়, বাণিজ্যিক সাফল্যেরও বহু রেকর্ড সে ভেঙে ফেলল। সকলের মুখে শুধু নানুক আর নানুক। খবর পেয়ে প্যারামাউন্টের মালিক হাত কামড়াতে লাগলেন আর প্রচুর বকাবকি করলেন অপদার্থ সহকারিদের, যারা তাঁকে নানুকের ডলার উপার্জনের ক্ষমতা বোঝাতে পারেনি। একই দিনে 'ব্রডওয়ে'তে মুক্তি পাওয়া হ্যারল্ড লয়েডের বক্স অফিসধন্য ছবি 'Grandma's Boy' এর ঘাম বেরিয়ে গেল 'নানুক' এর সঙ্গে পাল্লা দিতে।

দর্শকের পাশাপশি মিডিয়াও উচছ্বসিত। বিখ্যাত নাট্যকার সমালোচক রবার্ট শেরউড লিখলেন,"There have been many fine travel pictures, many gorgeous 'Scenics', but there is only one that deserves to be called great. That one is 'Nanook of the North'… Nanook was no playboy enacting the part, which could be forgotten as soon as the grease paint has been rubbed off; he was himself an Eskimo struggling to survive. The North was no mechanical affair of wind machines paper snow; 'the best Moving Pictures of 1922 – 23' এ Sherwood বললেন,---
"It stands alone, literally in a class by itself. Indeed, no list of all the best pictures of the year or of all the years in the brief history of all the monies could be considered complete without it."

আমেরিকার সমালোচকদের প্রশংসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও প্রশংসার মালা ফ্ল্যাহার্টির গলায় পরিয়ে দিলেন ইউরোপের ফিল্ম সম ালোচকেরা। এক ফরাসী লেখক 'নানুক'কে গ্রীস ক্ল্যাসিক নাটকের সঙ্গে তুলনা করলেন। সারা বিশ্বের দর্শক এক কথায়, ভালবেসে ফেলল ছবিটি। ব্রডওয়ের সঙ্গীত জগত, নানুকের উপর গান বেঁধে রেকর্ড বার করল। জন হ্যাগেন আর হার্ব ব্রুকার -এর কথায় সুর দিলেন ভিক্টর নুর্নবার্গ।
Cameo Music Publishing Company র গানটি হ'ল----
"Polar bears are prowling,
Wintry winds are howling,
Where the snow is falling,
There my heart is calling:
Nanook ! Nanook !
(এরপর সমবেত গায়কদের কোরাস)

Ever-Loving Nanook,
Though you don't read a book,
But, oh, how you can love,
And thrill me like the twinkling northern lights above…"

এর অনেক বছর পরে বার্লিনে গিয়ে ফ্ল্যাহার্টিরা নানুকের হাসিমুখের ছবি দেখেছিলেন জার্মান আইসক্রীম স্যান্ডুইচের মে ড়কে। 'Nanook of the North' মুক্তির বছর দুয়েক পর শিকারে গিয়ে প্রাণ হারাল 'নানুক', যার 'ইনুইট'উপজাতীয় আসল নাম ছিল Allakariallak. সারা পৃথিবীর কাগজে সংবাদ হ'য়ে গেল সে। কানাডা সরকার ববের জরিপ ক'রে মানচিত্র বানানো বেলচার (Belcher) দ্বীপের নতুন নাম দিলেন তাঁর নামে---- 'ফ্ল্যাহার্টির দ্বীপ'।

৩০ বছর পরে মানহাইম ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সারা পৃথিবী থেকে আসা তথ্যচিত্র পরিচালকদের বলা হয় সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্রগুলি বেছে দিতে। বলা বাহুল্য, Nanook of the North' কেই তাঁরা স্থান দিলেন সবার উপরে। আজ নতুন শতাব্দীতে পা রেখে, অনেক চমকপ্রদ তথ্যচিত্র দেখেও আমাদের অনুভূতি একই কথা বলে 'নানুক' দেখার পর। নানুক মুক্তি পাওয়ার আগেও ভ্রমণ - পর্যটনের ছবি হয়েছিল। Cherry Kearton ১৯০৯ সালে থিওডোর জভেল্টের আফ্রিকা অভিযানের, Herbert Ponting ১৯১৩ সালে রবার্ট ফলক্যান স্কটের বিয়োগান্তক অভিযানের (১৯১০-১৩), Emery & Ellsworth Kolb ১৯১১ সালে গ্র্যান্ড ক্যানিয়েনের, ১৯১৪-১৫ সালে Lowell Thomas আলাস্কার ছবি তুলেছিলেন। কেউই নানুককে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। বিখ্যাত ফিল্ম মেকার পল রটা (Paul Rotha) এর কারণ হিসেবে বলছেন,---'প্রথমতঃ, ফ্ল্যাহার্টির মধ্যে খনিবিদ পর্যটক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা, এই দুই বিপরীত অথচ সমধর্মী প্রতিভার সমন্বয় ঘটেছিল । তিনি ক্যামেরা চালাতে শিখেছিলেন নিজের প্রয়োজনে,কোনো প্রযোজকের ফরমায়েসে ফিল্ম তৈরির উদ্দেশ্যে নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর এস্কিমোদের সঙ্গে দিন কাটানোর বহু বছরের অভিজ্ঞতা এবং তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা। যে প্রাকৃতিক পরিবেশে তাঁকে কাজ করতে হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা। তৃতীয়ত, ফিল্ম বানাতে গিয়ে তাঁর প্রাথমিক অসফলতা। ১৯১৩ আর ১৯১৫য় তোলা ছবিগুলি দেখাতে দেখাতে সেগুলিতে চিত্রভাষার অভাব তাঁকে পীড়িত করেছিল। অজানা দেশের কিছু দুর্লভ দৃশ্য হাজ ার কষ্ট করে তুলে আনলেও তাতে তাঁর বন্ধু এস্কিমোদের জীবনযুদ্ধের আসল নাটকীয়তাই অনুপস্থিত। স্ব-শিক্ষিত চলচ্চিতকারদের যুগে তাঁকে ৩০,০০০ ফুট ফিল্ম নষ্ট করে, পাঁচ বছর বেকার জীবন কাটিয়ে অনেক মূল্য দিয়ে বুঝতে হয়েছিল চলচ্চিত্র মাধ্যমের দাবি। ফিল্মের নিজস্ব ভাষা। ১৯২০ সালে আর ভুল হয়নি তাঁর।' (Rotha, ed. Ruby, 40)

এস্কিমোদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বব বুঝেছিলেন, পৃথিবীর আদি বাসিন্দাদের ক্ষমতা আছে শিল্পকর্ম ও টিজির কাজকে আলাদা অ ালাদ আলাদা গুত্ব দেওয়ার। Aggie বা ফিল্ম বানানো শিকার ইত্যাদি কাজের সমার্থক নয়। অসুস্থ শরীরে নানুক শিকার করেছে সীল, ওয়ালরাস। তার ইগ্লুর দেওয়ালে কাশতে কাশতে তোলা রক্তের ছোপদেখেছেন বব। কিন্তু কোথাও তার মধ্যে সততা বা উৎস াহের অভাব দেখেন নি কখনো। aggie ব অশ্বাস। সে যেন বুঝতে পেরেছিল, তার শরীরী জীবনের ওপারে সবার অলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে এক চিরকালীন ইগ্লু---- মানুষের স্মৃতির উষ্ণতায় আশ্রয় দেবে বলে।

ফ্ল্যাহার্টি যেন এস্কিমোদের কাছেই নিয়েছেন শিল্পের পাঠ। জীবনবোধের প্রকাশ শুধু নয়, জীবনের সঙ্গে মানুষের বোঝাপড়ার মুহূর্তগুলি ধরে রাখাও শিল্পের অন্যতম প্রয়োজন। জীবনকে দেখার ভঙ্গি এস্কিমোদের সহজ ও স্বচ্ছ --- জীবনধারণের বিচিত্র কর্মপ্রবাহেই তাদের অস্তিত্ব। অবাধ্যপ্রকৃতির হাত থেকে ছিনিয়ে আনা বাঁচার রসদ সংগ্রহের আলেখ্যই তাদের ছবি ও কাশিল্পের বিষয়বস্তু । প্রাচীন গুহা চিত্রের মতই স্বতস্ফূর্ত। এস্কিমোদের ছবি এসেছে তাদের বাঁচার দুটি নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম থেকে। প্রথমে, আশ্রয় থেকে অভিযান অনির্দিষ্টর পথে। তারপর জয়লাভ। জয়লাভের পর সেই কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়ে ছবিতে লিখে রাখা ভবিষ্যতের জন্য । বার বার বর্ণনা করার জন্য। ফ্ল্যাহার্টির ফিল্ম যেন একই সূত্রে বাঁধা। তাঁর কাছেও প্রাথমিকভাবে এসেছে অনির্দিষ্টতায় অভিযান, ক্যামেরা দিয়ে দৃশ্য শিকার -- - তারপর তাকে চলচ্চিত্রে গ্রহণ করা। ভবিষ্যত কালের মানুষের কাছে বারবার বর্ণনার জন্য। তাঁর সংগ্রহ করা এস্কিমোদের ড্রইং যেন অজান্তে তাঁর 'ক্যামেরার চোখ' (Kino Eye) কে বাধ্য করেছে ছবির ফ্রেমিং ও কম্পোজিশনকে ওইভাবে দেখতে। তিনি আকাশ ও মা টির অংশ বিভাজন করেছেন ক্লাসিক পেন্টিংয়ের ভূমি বিভাজন- রীতিতে। কখনও ক্যানভাস বা পর্দায় একেবারে আধাআধি করে দেখ াননি। সব সময়েই হয় আকাশ বেশি, নয়তো ভূমি। এর মধ্যে চরিত্রদের প্রায়ই রেখেছেন এস্কিমোর চিত্রের আদলে। Short focusএর বদলে বেশি ব্যবহার করেছেন Long focus lens. দৃশ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে মুখের Close - up না দেখিয়ে চরিত্রদের বৈশিষ্ট্য ধ ারায় বেশি নজর দিয়েছেন । ইগ্লু তৈরীর সময়ে নানুকের ছোট্ট ছেলে একমনে চেষ্টা করছে ছোট তীর ধনুক। দিয়ে বরফের ছোট একটি

লোমশ প্রাণীকে শিকার করার। অথবা কুকুরছানাদের গলায় জুতে দিয়েছে ছোট খেলনা স্লেড। বড় হয়ে বাবার মতো শিকারী হওয়ার প্রস্তুতি । ইগ্লু তৈরি শেষ করে নানুক তার এই ছেলেকে শেখাচ্ছে সঠিকভাবে তীর ছোঁড়ার কায়দা। তারপর ঘষে ঘষে হাত গরম করে দিচ্ছে তার। সকালে উঠে নানুকের স্ত্রী নাইলা মুখে চিবিয়ে নরম করে দিচ্ছে শক্ত হয়ে যাওয়া নানুকের চামড়ার জুতো। মুখের লালায় ভিজিয়ে পরিস্কার করে দিচ্ছে তার বাচচার মুখ। একের পর এক নিরবচ্ছিন্ন কাজের শৃংখলা । আমাদের পরিচিত জীবনযাত্রার মতোই, অথচ সম্পূর্ণ অন্য প্রক্রিয়ার। এর নাটকীয় অভিঘাতেই চিত্রিত সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রটি। ফ্ল্যাহার্টির কথায়, "a story must come out of the life of a people, not from the action of individuals." । দুটি বা একাধিক ব্যক্তিমানুষের ভাবে আদানপ্রদান থেকে জাত দ্বান্দ্বিক জটিলতা, কথোপকথন ব্যবহার না করে একটি সরলরেখার মতো সজাগ দৃষ্টিক্ষেপ করে সাধারণ চোখ দিয়ে কোনো সমাজের সমগ্র ছবি তুলে ধরাকেই শ্রেয় মনে করেছেন তিনি। অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থানই যে মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন আর সেই তাগিদে প্রকৃতি ও অনির্দিষ্টতার সঙ্গে তার সপরিবার সংগ্রাম----এখানে নানুক আর নিজেকে এক মনে হয়েছে তাঁর । সভ্যতার গোড়াপত্তন সম্পর্কে ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) সঙ্গে তিনি এখানে একমত,---

"The communal life of human being had, therefore, a twofold foundation: the compulsion to work, which was created by external necessity, and the power to love, which made the man unwilling to be deprived of the part of herself which had been separated of from her---her child. Eros and Anake (love and necessity) have become the parents of human civilization too." এই communal life বা যৌথ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রকৃতি মানুষের সহাবস্থানের দৃশ্যময়তার অপার বিস্ময়----এরাই নিয়ন্ত্রণ করেছে ফ্ল্যাহার্টির চলচ্চিত্রবোধ. কাহিনীচিত্রের কল্পিত নাট্যরসের পরিবর্তে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে চলচ্চিত্রের বাস্তবতার নিজস্ব নাটক রচনায়। দ্রুত শিল্পায়নে ক্লান্ত পর্যুদস্ত পাশ্চাত্যের মানুষকে তিনি ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন মনুষ্যজীবনকে ভালবেসে দেখার এক সহজ দৃষ্টিভঙ্গী। জন্ম নিয়েছে ফ্ল্যাহার্টিবাদ, যাতে দীক্ষিত হয়েছেন বহু বাস্তববাদী চলচ্চিত্রকার--- Arne Sucksdorff, John Huston, Richard Leacock, Fred Zinneman এর মতো অনেক। চিত্রকার রেনোয়ার পুত্র স্বনামধন্য পরিচালক জঁ রেনোয়া (Jean Renoir) বলেছেন, --- "He was man made of love. That is why he had so much feeling for the characters in his films. He loved them, that is all."

মানুষ জীবন, নিজেকে পারিবারকে ভালবেসে 'Myth' বা প্রবাদে পরিণত হয়ে গেছেন তিনি। সবাইকে বাদ দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক কোনো অদ্ভূত জীবন যাপন করতে হয়নি তাঁকে। ফিল্ম বানানোর জন্য একা আলাদা হয়ে কৃচ্ছসাধনও করেননি। বেশিরভাগ অভিযানেই গেছেন সপরিবারে। সঙ্গে তিন মেয়ে, তাদের আইরিস 'মেড' আর ফ্রাঁসেজ। ফ্রাঁসেজকেও যত্ন করে শিখিয়েছেন ফিল্মের টেকনিক্যাল কাজ। সারা জীরন ধরে বারবার অবস্থার ওঠাপড়া, খ্যাতির বিলাস, অর্থাভাব, কাজের সন্ধানে দেশ বদল--- সবকিছুই সপরিবারে ভাগ করে নিয়েছেন ফ্ল্যাহার্টিরা। নানুকের ফিল্ম - অভিযানে সঙ্গে থাকতেন ভাই ডেভিড ফ্লাাহার্টি। 'লুইজিয়ানা স্টোরি'র শ্যুটিংয়ে ছিলেন রিচার্ড লীককও---সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে। সঙ্গীত ভালবাসতেন খুব। নানুকের শ্যুটিংয়ের দিনগুলোর ফোনোগ্রাফ রেকর্ড বাজিয়ে গানবাজনা শোনাতেন এস্কিমোদের । একটি রেকর্ড ডিস্ককে কামড়ে পরখ করে দেখার একটি মজাদার দৃশ্যও আছে'Nanook of the North' এ। ফ্ল্যাহার্টি নিজে যেমন অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারতেন, অন্যদেরও রেহাই দিতেন না কাজের ব্যাপারে। শুধু টাকাপয়সার ব্যাপারে মাথাটা ঘামাতে চাইতেন না। কোথা থেকে টাকা আসছে, কত খরচ হয়ে যাচ্ছে সে সবে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। 'রেভিল্লঁ' কোম্পানীর সঙ্গে যত টাকায় চুক্তি হয়েছিল, তার দ্বিগুণ খরচে গিয়ে শেষ হয় 'নানুক'----৫৩,০০০ ডলারে। অতিরিক্ত টাকার অঙ্ক ধার হিসেবে পেলেও, নানুকের প্রদর্শন থেকে তাফেরৎ দিতে পেরেছিলেন ফ্ল্যাহার্টি । শেষ পর্যন্ত প্রচুর লাভের মুখ দেখেছিলেন তিনি, প্যাথে কোম্পানীও।

নানুকের এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যে আমেরিকান প্রযোজকরা নড়ে বসলেন। ফেমাস প্লেয়ার -ল্যাস্কির প্রদর্শন সংস্থা প্যারামাউন্ট ফ্ল্যাহার্টিকে ফিরিয়ে দেওয়ার আফসোস করেছে অনেক। তারই অন্যতম মালিক জেসি ল্যাস্কি একদিন ফ্ল্যাহার্টিকে ডেকে বললেন, "I want you to go off somewhere & make me another Nanook. Go where you will, do what you like. I will foot the bills. The word's your oyster." চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন ফ্ল্যাহার্টি। কিন্তু একই জিনিষ কি দুবার করা যায় ? লেখক বন্ধু ফ্রেড্ রিক ও'ব্রায়েনের (White shadows in the Soth Seas এর রচয়িতা) পরামর্শে পাড়ি দিলেন সামোয়া দ্বীপপুঞ্জে। সাভাই'ই দ্বীপের সাফুনে গ্রামে এসে অস্তানা গাড়লেন সপরিবারে। কী তুলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না কয়েকমাস। প্রাচীন পলিনেশিয়ান আদিবাসীরা সাদা চামড়ার ত্রিশ্চান নিশনারীদের প্রভাবে হয়ে গেছে জামা-প্যান্ট পরা বাদামী সাহেব। লেঙটি পরে ঘুরে বেড়ায় না। ভুলে গেছে তাদের আদি জীবন ধারণের প্রনালী। জীবনধারণের সমস্যাও নেই। ফল, মাছ, কাঁকড়া, নারকেল---অঢেল খাদ্য। পান ক'রে, ফুলের গয়নায় সেজে আনন্দ করে তারা। কোথায় বরফঝড়, প্রতিদিন বাঁচার নিয়ত সংগ্রামআর কোথায় এই শান্তির নীড় প্রশান্ত মহাসাগরের

দ্বীপ ! ফ্ল্যাহার্টি অনেকদিন এটা সেটার ছবি তুলে কাটালেন। বইয়ে পড়া রাক্ষুসে অক্টোপাসেরও দেখা পেলেন না। শেষে তিনি ঠিক করলেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা আসার আগেকারজীবন তুলবেন এখানে। উপজাতির সর্দারকে বোঝালেন তাঁর ফিল্মের উদ্দেশ্য। পুষদের শ র্ট বদলে অঙ্গে উঠল 'সয়াপো', গাছের ছাল থেকে তৈরি সুতোয় বোনা 'টাপা' কাপড়ের লেঙটি। ফ্ল্যাহার্টির কথায় গভীর জলে গিয়ে মাছধরল তারা। 'টাপা' কাপড় তৈরি করা থেকে সারা পিঠে উল্কি করানোর কষ্টকর সব কাজই ধৈর্যর সঙ্গে করল। ছবিতে 'প-আ' ন ামের একটি ছেলেকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে রাখলেন ফ্ল্যাহার্টি। তৈরি হল 'Moana'.১৯২৬ সাল। প্রতিষ্ঠা পেল ফ্ল্যাহার্টিয় চলচিচত্র - বাস্তববাদ। এই আধুনিক ধারায়, দলিলের জন্য সমসাময়িক বাস্তব পরিবেশ ওচরিত্রদের দিয়ে অন্য এক Time & Space এর বাস্তবত ার পুনর্নির্মাণ করা হয়। সেটা হ'য়ে ওঠে বর্তমান বাস্তবের অন্তর্লীন আর এক বাস্তব যা আদিকাল থেকে চিরপ্রবহমান। ম্যাথু জোসেফসন 'মোআনা' দেখে লিখলেন,"Flaherty has done more than give us only a beautiful spectacle. With his broad vision he has suddenly make us think seriously, in between the Florida boom and our hunting for bread and butter in Wall Street, about the art of life. Here he says to us, are people who are successful the same in the art of life. Are we that, with our motorcar factories, sky scrapers, radio – receivers?" ---সভ্যতার মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে তার ঊষাকালের মাধুর্যের জন্য এই হাহাকার বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেয়, ফ্ল্যাহর্টি কোন মূল বিন্দুতে দাঁড়িয়ে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর সিনেমার দর্শন । আদিমতার মুখোমুখি হ'য়ে আধুনিকতার প্রতিনিধি হিসেবে এক কষ্টকর অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপন্ন হয়েছিল তাঁর অস্তিত্ব।

এই বিস্ময়াবিষ্ট বিপন্নতা নিয়েই সৃষ্টি করেছেন কিছু কালজয়ী চলচিচত্র---'নানুক অব দি নর্থ' 'মেআনা', 'আ রোম্যান্স অব দি গোল্ডেন এজ', 'ম্যানু অব আরান', 'দি ল্যাণ্ড', 'লুইজিয়ানা' স্টোরি। এছাড়াও বানিয়েছেন 'দি পটারি মেকার', 'দি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্রিটেন', 'হোয় াইট শ্যাডোজ অন দি সাউথ সীজ' (MGMপ্রয়োজনা), 'টা' (জার্মান পরিচালক মুরনাউয়ের সঙ্গ) আর 'দি এলিফ্যান্ট বয়' (আলেকজ াণ্ডার কোর্ডার অধীনে, ভারতের মহীশূর রাজ্যে)। রঙিন চলচিচত্রের রমরমার যুগে বসে ছবি তুলেছেন সাদা - কালোয়। Sound film এর যুগে বসে পরীক্ষা নিরীক্ষাও করেননি শব্দের চমক নিয়ে। Visual narrativeএরউপর এমনই আস্থা ছিল তাঁর। 'নানুক' এ বরফের ঝড়ের হিস্ হিস্ শব্দ আর কুকুরের একটানা ডাক ঢোকাতে পারেননি--এইটুকুই আক্ষেপ ছিল। বন্ধু ও সমসাময়িক ফিল্ম মেক ার, বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনায় আক্রান্ত হয়েছেন বারবার--টলেননি নিজস্ব বোধের জায়গায়। গ্রাহাম গ্রীনের মতো লেখক'ম্যান অব অ ারান' নিয়ে পরিহাস করেছেন। জিগা ভের্তফের মতো নতুন ধারার পরিচালক তাঁকে মনে করেছেন পলায়নবাদী। আজন্ম বন্ধু জন গ্রিয় ারসন ফ্ল্যাহার্টির গুণমুগ্ধ হয়েই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন সমকালীন বাস্তবের দিকে নজর দিতে। কাজ হয়নি কিছু। নিউ জা র্সির Standard Oil Company র জন্য ১৯৪৮ -এ নিজের স্টাইলেই বানিয়েছেন 'Louisiana Story' ---- হলিউডে যার প্রিমিয়ার শো দেখে তাঁকে একসাথে টেলিগ্রাম করেছেন মুগ্ধ চার্লি চ্যাপলিন, জঁ রেনোয়া ও কাড্লি নিকল্স্ : "Do this again and you will be immoratal and excommunicate from Hollywood which is a good fate" । হলিউডেখাপ খাওয়াতে না পেরে হাত মিলিয়ে ছিলেন 'মূরনাউ'এর সঙ্গে। তাঁর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপোস করতে না পেরে দেশত্যাগী হয়ে সপরিবারে গিয়েছিলেন জার্মানি, সঠিক মূল্য পাওয়ার আশায়। সরকারী শ প্রযোজনার দ্বারস্থও হয়েছেন। বিফল হয়ে চলে আসছেন লণ্ডন । বন্ধু গ্রিয়ারসনের এই সময়ের উপকার ভোলা যায়না। অর্থের প্রয়োজনে শেষ বয়সে রাজি হয়েছিলেন 'সিনেরামা' টেকনিকে ছবি তুলে দিতে। প্রচণ্ড আর্থ ারাইটিসের যন্ত্রণা ভুলতে 'মরফিনে' আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হতো তাঁকে। মৃত্যুর কিছু আগে নিজেদের Farm house এ ফিরে এসেছিলেন, ফ্রাঁসেজের সঙ্গে। তখনও ছক কষছেন ঝিপরিত্রমার। ১৯৫১র ২৩ শে জুলাই সব শেষ হয়ে গেল। ৬৭ বছর বয়সে চলে গেলেন রবার্ট যোসেফ ফ্ল্যাহার্টি । সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে।

একাধরে ইতিহাসের উপাদান ও তার কঠোর সমালোচক হয়ে বেঁচে রইলেন রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি। শৈশবের হতশ্রী রেডইণ্ডিয়ানরা তাঁকে অ াজীবন ব্যস্ত রাখল মানুষের মূল জীবনধারার খোঁজে। নানুক হয়ে উঠল তাঁর পরা-ব্যক্তিত্ব (alter ago)। এক অনির্দিষ্ট শিকারের অভিযানের মতো কেটে গেল ববের জীবন। মাঝে মাঝে ধরা পড়ল সাফল্যের ওয়ালরাস। মসৃণ নিটোলভাবে কাটল না দিনগুলো। অ ামৃত্যু হাতে রয়ে গেল অদৃশ্য হারপুন। সময়ের তুষারঝড়ে বুক পেতে চিরকাল, সটান দাঁড়িয়ে রইল এক প্রতিবাদী মানুষ। শরীর যেন একটাই, শুধু নাম আলাদা---- 'বব' আর 'নানুক'।

ঋনস্বীকার ঃ

১. Arthur Calder- Marshal: the Innocent Eye, the life of R.J. Flaherty (based on research material by Paul Rotha and Basil (Wright)- W. H. Allen' 63

২. Eric Rhode: A History of the Cinema – Penguin' 76.

৩. Eric Barnouw: Documentary, A history of the nonfiction Film- Oxford university Press' 76.
৪. Richard Griffith: The World of Robert Flaherty' 63.
৫. Richard Barsum: The Vision of Robert Flaherty.
৬. ভাস্কর দাশগুপ্ত মানুষের উৎস সন্ধানে ; রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির চলচ্চিত্র ---- 'তথ্যচিত্রকথকতা', ঋত্বিক সিনে সোসাইটি' ৯৬
৭. গৌতম চট্টোপাধ্যায়--- গ্রন্থগারিক, ঋত্বিক মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, 'নন্দন'।